মুসলিম উম্মাহর পতন; উত্তরণের পথ

জিয়াউল হক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

পতন পরিক্রমা ॥ ১১

একটি পরিচিত; একটি পৃথক আইডেন্টিটি ॥ ১৯

প্রথম হোঁচট ॥ ২৫

পোপের কুটিল কৌশল : সুইসাইড মিশন ॥ ৩১

দৃশ্যপটের পরিবর্তন ॥ ৩৪

হাওয়া বদল ॥ ৩৬

সংঘাত ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি ॥ ৪২

একটি যুদ্ধ এবং ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন ॥ ৫১

ইসলামি ও ইরানি সংস্কৃতি ॥ ৬১

সংস্কৃতি ॥ ৬৩

ইসলামের প্রাণে পঞ্চমুখী আঘাত ॥ ৮১

পুঁজিবাদ ॥ ৮৮

বস্তুবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উৎপত্তি এখান থেকেই ॥ ৯৯

একনজরে বস্তুবাদ ॥ ১০১

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ॥ ১০২

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মতবাদ প্রবক্তাদের নৈতিক যুক্তি ॥ ১০৪

সাম্রাজ্যবাদ কী, সম্প্রসারণবাদ কী ॥ ১১৪

সাম্রাজ্যবাদের কারণ ॥ ১২০

সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস ॥ ১২২

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা ॥ ১২৪

বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন ॥ ১৩০

চিন্তার আগ্রাসনকে সহজ করেছে ॥ ১৩২

বৈষম্য ॥ ১৩৫

বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদেরই একটি রূপ মাত্র ॥ ১৩৭

বিশ্বায়নের ইতিবাচক ফলাফল ॥ **১৩৯**
ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ ॥ **১৩৯**
উত্তরণ-পূর্ব কথা ॥ **১৪৫**
কাজেই ভাবতেই হবে ॥ **১৪৮**
চিন্তার পুনর্গঠন ॥ **১৫২**
প্রজ্ঞা ॥ **১৫৫**
যুগের ভাষা বুঝুন ॥ **১৬৫**
আত্মপরিচয় ॥ **১৬৭**
অতএব ধর্মাশ্রয়ী হোন ॥ **১৬৯**
ইতিহাসচর্চা ॥ **১৭৪**

পতন পরিক্রমা

আজকের মুসলমানরা যে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহে বসবাস করছে, সেই আবহকে এমনি এমনি বোঝা যাবে না। একে বুঝতে গেলে আগে আমাদের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সামসময়িক ঘটনা বুঝে নিতে হবে। এই ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতাতেই বিশ্ব এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উপনীত হয়েছে। সংঘটিত হয়েছে রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং সামাজিক বিবর্তনও।

আমরা সবাই জানি, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা মূলত খ্রিষ্টবাদী সমাজ ও গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। মুসলমান সমাজ নিজেদের যতই স্বাধীন বলে মনে করুক না কেন, তারাও প্রকারান্তরে ওই খ্রিষ্টবাদী সমাজ কর্তৃক প্রভাবিত। এ প্রভাব থেকে বের হয়ে এসে নিজেদের স্বকীয় ও স্বাধীন কর্মনীতি অবলম্বনের আপাত কোনো সম্ভাবনা মুসলিমদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে চাইলে, বর্তমান মুসলিম সমাজ পশ্চিমা খ্রিষ্টবাদী সমাজের চিন্তা ও দর্শনের কাছে পুরোপুরি বাঁধা পড়ে গেছে।

এটা একধরনের আদর্শিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব। কিন্তু এই দাসত্ব থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত মুসলিম জাতি ও দেশসমূহের নীতি বা কর্মপদ্ধতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তবে তার মানে এই নয়, তারা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির কোনো চেষ্টাই করছে না।

বিগত ৪০০ বা ৫০০ বছর ধরে বিশ্বের বহু দেশে নাম জানা, না জানা বহু মুসলিম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীই এ লক্ষ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিছেন। এমনকি কেউ কেউ এ লক্ষ্যে তাদের জীবন, সম্পদসহ সর্বস্ব বিলিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এখনও পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান সফলতা ধরা দেয়নি। তাই চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়াও সম্ভব হয়নি মুসলিম উম্মাহর।

বিগত প্রায় ১০০ বছর ধরে অনেক মুসলিম দেশই উপনিবেশবাদের ছোবল থেকে রাজনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এ কথা সত্য। কিন্তু এই স্বাধীনতা দিনশেষে তাদের জীবনে অর্থবহ কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ? চিন্তার দাসত্ব।

এই চিন্তার দাসত্ব কোন পথে, কীভাবে মুসলিম মানসে প্রবেশ করেছে? আর তার পরিণামই-বা কী হয়েছে? আজ এই প্রশ্নটা করা খুবই প্রয়োজন। প্রয়োজন নিজেকে বিবেকের আয়নায় দাঁড় করিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা করা—আমরাও কি মস্তিষ্কে এই দাসত্ব ধারণ করে আছি? আজও কি বয়ে চলেছি সাম্রাজ্যবাদের বিষ?

এর পাশাপাশি কোন পথে এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, সেটাও জানা প্রয়োজন। আর তা জানতে হলে ইতঃপূর্বে নানা যুগে আমাদের যেসব মুসলিম মনীষী চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তির চেষ্টা করেছেন, সেগুলো জানতে হবে। আবার তাদের সে চেষ্টা কেনই-বা ব্যর্থ হয়েছে, সে বিষয়েও আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হলে সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার অন্দর-বাইর। কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শের ওপরে এই বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কী, সেসব নিয়েও ধারণা রাখতে হবে।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের পরবর্তী আলোচনা পরিচালিত হবে। অনেক বড়ো পরিসরে সম্ভব না হলেও এ গ্রন্থে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম প্রশ্ন হলো, মুসলিমদের ঐক্যের জায়গায় আঘাতের শুরুটা কীভাবে হয়েছে? উত্তর হলো, চিন্তার জগতের নৈরাজ্যই মূলত অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে ধসিয়ে দিয়েছে। এই নৈরাজ্যের সূচনাটা হয়েছিল খিলাফতের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে।

তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পরে ৩৭ হিজরিতে আলি (রা.) চতুর্থ খলিফা হিসেবে ক্ষমতা নেন। তাঁর নির্বাচন ও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াকে কেন্দ্র করে পুরো মুসলমান সমাজ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের একটি দল আলি (রা.)-কে সমর্থন করলেও অপর দলটি সম্মানিত সাহাবি মুয়াবিয়া (রা.)-কে সমর্থন করেন।

এই দুই সম্মানিত সাহাবির মধ্যে কে প্রকৃতার্থে খলিফা কিংবা কার খিলাফত বৈধ—এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে পুরো মুসলিম উম্মাহ একটি ভয়ানক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আর তারই সূত্র ধরে ৬৫৭ সালের জুলাই মাসে সূচনা হয় সিফফিনের যুদ্ধের। যুদ্ধটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ঘটনা।

বিশেষ করে তখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে গড়া লক্ষাধিক সাহাবি জীবিত ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই এই যুদ্ধের ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়েন। সিনিয়র সাহাবিগণ ভ্রাতৃঘাতী এ যুদ্ধ বন্ধে তৎপর হন। তাঁরা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি সালিশি কমিটি গঠন করেন। এজন্য দুজন বিচারক নির্ধারণ করে তাঁদের ওপরে দায়িত্ব দেন। সিদ্ধান্ত হয়, তাঁরা দুজনে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে যে সিদ্ধান্ত দেবেন, বিবদমান পক্ষগুলো সেগুলো মেনে নেবেন।

এরই সূত্র ধরে একসময় আলি ও মুয়াবিয়া (রা.)—এই দুই সম্মানিত সাহাবির মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক সমঝোতা হয়। এ সময় আলি (রা.)-এর দল থেকে কয়েক হাজার সৈন্য বিদ্রোহ করে দল ত্যাগ করে।

তাদের অভিযোগ ছিল, খলিফা আলি (রা.) কাফির হয়ে গেছেন! তাঁর ঈমান চলে গেছে। কেননা, তিনি সূরা হুজুরাতের ৯ নং আয়াতের নির্দেশনাটি মানেননি। সেই আয়াতে বলা আছে—'মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একদল যদি সীমালঙ্ঘন করে, তবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; যতক্ষণ তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসে।'

মুয়াবিয়া (রা.)-এর দল যেহেতু সীমালঙ্ঘনকারী, তাই তারা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আলি (রা.) তা না করে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করার মাধ্যমে সূরা হুজুরাতের উক্ত আয়াতটির স্পষ্ট লঙ্ঘন করেছেন। ফলে তিনি কাফির হয়ে গেছেন। একদিন আলি (রা.) কুফার একটি মসজিদে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় মসজিদের এক কোনায় 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ' বা 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া আরও হুকুম মানি না' স্লোগান দিয়ে হট্টগোল করা হয়।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে বিরোধের নিষ্পত্তিকল্পে গঠিত সালিশি কমিটির দিকে ইঙ্গিত করে তারা আলি (রা.)-কে উদ্দেশ করে বলে, আপনি বিচারব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন! অথচ বিচারের মালিক স্বয়ং আল্লাহ। তারা তাদের দাবির সপক্ষে সূরা আনআমের ৫৭ নং আয়াত অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত কারও ফয়সালা গ্রহণযোগ্য নয়'-এর উদ্ধৃতি দেয়। তারপর দাবি করে, আলি (রা.) আল্লাহর হুকুম ভঙ্গ করেছেন। আর আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণে তিনি মুরতাদ হয়ে গেছেন!

যেহেতু কাফিরের আনুগত্য করা জায়েজ নেই, তাই যে বা যারা আলি (রা.)-কে কাফির মানবে না, তারাও কাফির। তাদের এই হিসেবে সকল সাহাবি কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেছে!

এই দলটি ইতিহাসে খারেজি হিসেবে পরিচিত। খারেজি শব্দের অর্থ বের হয়ে যাওয়া বা বহিষ্কৃত। এই দলটি সর্বপ্রথম একটি বৈধ খিলাফত অস্বীকার করে মুসলিম উম্মাহর মূল অংশ থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর মদিনার অদূরে হারুরা প্রান্তরে আলাদা বসতি স্থাপন করে। এর মধ্য দিয়ে তারা একটি ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে আলাদা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে ফেলে।

এ সময় সকল সচেতন মহল থেকে তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এ লক্ষ্যে আলি (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে তাদের নিকট পাঠান। তাঁর প্রচেষ্টা একেবারে বিফলে যায়নি। দীর্ঘ আলোচনার পর খারেজিদের একটা অংশ সঠিক পথে ফিরে এলেও অধিকাংশই পথভ্রষ্ট থেকে যায়।

এই খারেজিরা প্রায় সকলেই ছিল কট্টরপন্থি, অত্যন্ত উগ্র মতাবলম্বী। আলি (রা.)-এর প্রতি অনুগত এবং তাঁর খিলাফতের অধীনে থাকা সকল মুসলিমকে তারা কাফির বলে মনে করত। তারই ধারাবাহিকতায় প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রা.)-কে তারা সপরিবারে হত্যা করে।

সম্মানিত এই সাহাবির অপরাধ কেবল এতটুকুই ছিল, তিনি আলি, মুয়াবিয়া (রা.)-সহ এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়িত পক্ষ-বিপক্ষের সাহাবিদের কাফির মনে করতেন না। শুধু এ কারণেই তারা ইবনে খাব্বাবকে নদীর পারে নিয়ে জবাই এবং তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পেট চিরে তাঁকেও নৃশংসভাবে হত্যা করে!

খলিফা আলি (রা.) নৃশংস ও বর্বর এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করলে হত্যাকারীরা দম্ভভরে এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়, এই কাফিরকে(!) আমরাই হত্যা করেছি।

এটা ছিল সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহ; প্রকারান্তরে আলি (রা.)-এর খিলাফতকেই চ্যালেঞ্জ করে বসা। ফলে খলিফা হিসেবে আলি (রা.)-এর সামনে আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি খারেজিদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। এর সূত্র ধরেই হারামাউতের প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সংঘটিত হয়।

হারামাউতের প্রান্তরে খারেজিরা পরাজিত হলেও তাদের কিছুসংখ্যক পালিয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবারও খারেজি মতবাদ প্রচার শুরু করে। এভাবেই ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এই ভ্রান্ত মতবাদ।

খারেজিদের মাধ্যমেই প্রথম ইসলামি চিন্তার বিকৃত প্রচার হতে থাকে। সমাজে সাধারণ মুসলমানদের মনোজগতে আসন গাড়তে থাকে চিন্তার নৈরাজ্য। অবশ্য এ রকম ধারার উন্মেষ আমরা খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই দেখতে পাই। তবে এটি ছিল বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা।

যেমন : আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গনিমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন বনু তামিম গোত্রের 'জুল খুওয়াইসারা' নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইনসাফ করুন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে কে ইনসাফ করবে? আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে তো তুমি ক্ষতিগ্রস্ত ও নিষ্ফল হবে।

উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, ওকে যেতে দাও। তার কিছু সঙ্গীসাথি রয়ে গেছে। তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাত এবং তাদের সিয়ামের তুলনায় নিজের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালির নিম্নদেশে প্রবেশ করে না। তারা দ্বীন থেকে এত দ্রুত বেরিয়ে যাবে, যেমনিভাবে তির শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তিরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে, কিন্তু (শিকারের) চিহ্ন দেখা যাবে না। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কোনো কিছুর দেখা মিলবে না। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোনো চিহ্ন পাওয়া যাবে না। অথচ তিরটি শিকারের নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। তাদের নিদর্শন হলো এমন একজন কালো মানুষ, যার একটি বাহু নারীর স্তনের ন্যায় অথবা গোশতের টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা মানুষের মধ্যে বিরোধকালে আত্মপ্রকাশ করবে।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে—লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওই ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে, যারা কুরআন পড়বে; কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে তির বের হয়ে যায়। তারা মূর্তিপূজারিদের ছেড়ে দেবে এবং মুসলমানদের হত্যা করবে। যদি আমি তাদের পাই, তাহলে 'আদ' জাতির মতো তাদের হত্যা করব।[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবির ইবনে আবদল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 'জিরানা' নামক স্থানে দেখা করে। এটি সেই স্থান, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মাল বণ্টন করছিলেন। সাহাবি বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের ওপর রুপার টুকরাগুলো রাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ মুষ্ঠিবদ্ধভাবে মানুষকে গনিমত দান করছিলেন। তখন উপস্থিত ওই লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং ইনসাফ করুন! রাসূলুল্লাহ বললেন, ধ্বংস তোমার জন্য। আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে কে ইনসাফ করবে? আল্লাহর কসম! আমার পরে তোমরা এমন কোনো লোক পাবে না, যে আমার চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ।

---

[১] সহিহ বুখারি : ৩৬১০; সহিহ মুসলিম : ১০৬৪; মিশকাত : ৫৮৯৪

[২] সহিহ বুখারি : ৭৪৩২; সহিহ মুসলিম : ১০৬৪; মিশকাত : ৫৮৯৪

সঙ্গে সঙ্গে উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন—না, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। যদি এমন করো, তবে লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথিদের হত্যা করি...[৩]

ইতিহাসের পাতায় এই ঘটনা জুল খুওয়াইসারার ঘটনা হিসেবে পরিচিত। তবে এ ঘটনাটি ছিল একজন ব্যক্তির চিন্তা ও মতামতকেন্দ্রিক। এ চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে ওই সময় তারা সামাজিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক কিংবা সাংগঠনিক কোনো পর্যায়েই আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। এর কারণ হলো, তখনও এই চিন্তার তেমন বিস্তৃতি ঘটেনি।

উক্ত ঘটনার প্রায় ৪০ বছর পর পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনেকটাই পালটে যায়। আলি (রা.)-এর শাসনকাল নাগাদ এ রকম চিন্তাধারা লোকজন অনুকূল পরিবেশ পায়। ফলে সহায়ক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে তারা দ্রুত আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে (বিশেষ করে মিশর, পারস্য, লোহিত সাগরের তীরবর্তী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কিছু এলাকা; ইথিওপিয়া, সুদান ইত্যাদি এবং উত্তর আরবের রোমান সংস্কৃতিনির্ভর শাম, সিরিয়া, দামেশক এলাকা) বিভিন্ন মতাদর্শের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। তাদের অনেকেই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল মদিনায় হিজরত করেছেন, বসতি গেড়েছেন বা নানা ধরনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়ে তুলেছেন। নানা ধরনের চিন্তাচেতনার লোক এসে যুক্ত হয়েছেন একই প্ল্যাটফরমে।

এ রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তনের সূত্র ধরে তাদের মধ্যে বাসা বাঁধতে থাকে চিন্তার নৈরাজ্য। আর ক্রমেই তা বিস্তৃত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত সাহাবিদের প্রাণ বধ পর্যন্ত শুরু হয়; তাও আবার কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার আড়ালে বৈধতা দিয়েই!

এভাবেই শুরু হয় আকিদার বিচার। শুরু হয় কে কাফির, কার ঈমান কতটা ভঙ্গুর বা কতটা ভেজাল, তা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও ফতোয়ার ঝড়। ফতোয়া না মানলে তাকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে তারা নিজেরাই আকিদার বিচার করে। এরপর রায় ঘোষণা ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতি উম্মাহর কেন্দ্রীয় ঐক্য-চেতনার একেবারে মূলে গিয়ে আঘাত হানে।

ইতিহাসের এই ঘটনার ভেতরে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে। কেবল প্রয়োজন একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি। ইতিহাস সাক্ষী, এই খারেজিদের অধিকাংশই ছিল অল্পবয়স্ক যুবক। তাদের মধ্যে কপটতা বা ইসলামের ক্ষতি করার কোনো নিয়ত ছিল না। তারা বরং আন্তরিকভাবেই কুরআনের শিক্ষা ও অনুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে।

তবে তাদের ভুলের পরিমাণটা ছিল মারাত্মক। তারা কুরআনের মর্ম, এর দর্শন ও শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেনি।

কুরআন ব্যাখ্যা ও তার বাস্তব প্রয়োগের বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মনীতি ও প্রজ্ঞাময় কৌশলকে বিবেচনায় নেয়নি; বরং তাদের সকল কাজ পরিচালিত হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ দ্বারা।

---

[৩] সহিহ মুসলিম : ১০৬৩; *সহিহুল জামে* : ৫৮৭৮

অথচ তারা প্রায় সকলেই ছিল অত্যন্ত ইবাদতগুজার। তারা এত বেশি কুরআন তিলাওয়াত করত যে, তাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যেত না। তিলাওয়াতের বশে কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে যেত!

আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবকে হত্যা করার সময় এক খারেজি ভুলক্রমে এক খেজুর বাগানের একটা খেজুর খেয়ে ফেলে। এতে তাদের এক নেতা তাকে তিরস্কার করে বলে, তুমি বাগানের মালিকের অনুমতি ছাড়াই খেজুর খেলে? এটা শুনে সেই খারেজি তৎক্ষণাৎ সেই খেজুর উগরে দেয়।

আরেক খারেজি একইভাবে একটা শূকরকে আঘাত করে। ফলে তার সাথিরা বলে ওঠে, এটা তো অন্যায়! তুমি তো আল্লাহর জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং পরের সম্পদ নষ্ট করছ! তখন তারা সেই শূকরের অমুসলিম মালিককে খুঁজে বের করে তার দাম পরিশোধ করে দেয়।[৪]

কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি ও ইসলামের পাবন্দি বজায় ছিল তা নয়; বরং বাস্তব জীবনেও অত্যন্ত আমলদার মুসলমান হিসেবে পরিচিত ছিল।

ইতঃপূর্বে উল্লেখকৃত জুল খুওয়াইসারার ঘটনায় আমরা দেখেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে থাকতেই এমন একটি দলের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর উম্মতের মধ্যে এ রকম একটা দলের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সেখানে তিনি এ জাতীয় লোকদের কিছু বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা হবে ইবাদতে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী; কিন্তু নিজেদের ইবাদতের জন্য হবে অহংকারী। লোকেরা তাদের ইবাদত দেখে অবাক হবে।[৫]

এই গোষ্ঠীর লোকজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরবর্তী সময়কালে উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধের সময় আবির্ভূত হবে। সে বিষয়েও তাঁর বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মতভেদ ও মতানৈক্যের সময় তাদের আবির্ভাব হবে।[৬] তারা বিশ্বের সবচেয়ে সত্য ও সঠিক গ্রন্থ, পথনির্দেশনার আকর কুরআন থেকেই জ্ঞান নেবে। কিন্তু সে জ্ঞানকে তারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। নিজেদের বা কারও কল্যাণে কাজেও লাগাতে পারবে না। সে দিকে ইঙ্গিত করেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—শেষ জামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক ও নির্বোধ। তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে, অথচ তাদের ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না...[৭]

তারা ইসলাম, কুরআন ও হাদিস বিষয়ে জ্ঞানের ধারক হলেও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হবে না, প্রজ্ঞাও থাকবে না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—তারা হবে নবীন, তরুণ ও নির্বোধ; অথচ নিজেদের অনেক জ্ঞানী মনে করবে।[৮]

অপর একটি হাদিসে প্রখ্যাত সাহাবি আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ

---

[৪] *তালবিসুল ইবলিস*, ইবনুল জাওজি (রহ.)

[৫] মুসনাদে আহমাদ : ১২৯৭২

[৬] সহিহ বুখারি : ৬৯৩৩

[৭] সহিহ বুখারি : ৬৯৩০; মিশকাত : ৩৫৩৫

[৮] সহিহ মুসলিম : ২৪৬২, ২৪৬৯

করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা আর দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমনভাবে ধনুক তূণীতে ফিরে আসে না। বলা হলো, তাদের আলামত কী? তিনি বললেন, তাদের আলামত হচ্ছে মাথা মুণ্ডন করা।[৯]

তারা দ্বীনদারিতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে, এমনকি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে।[১০]
জুল খুওয়াইসারার এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই সম্ভবত প্রথম 'খারেজি' ছিল। সে নবিজির রায়ের ব্যাপারে প্রকাশ্যে এবং তাঁরই সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করে। আর নিজের মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করে।

তবে তার কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি তখনও ছিল না। সম্ভবত তার মতো চিন্তা ও চেতনা লালন করে—এমন কোনো লোকও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সময় ছিল না। অন্তত প্রকাশ্যে আসেনি। তাই চিন্তার এই মতপার্থক্য ওই সময় বিশেষ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর এক এক করে তিন সাহাবি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তাদের সময় অর্থাৎ প্রথম তিন খলিফার সময় সমাজে এ ধরনের চিন্তামানসসম্পন্ন লোকের উপস্থিতি থাকলেও তারা রাষ্ট্র ও উম্মাহর বিশেষ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে সেই পরিস্থিতি পরবর্তী সময়ে আর বজায় থাকল না। আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রা.) ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে বর্বরোচিত পন্থায় হত্যা করা হলো। ফলে ইসলামি খিলাফতের আমিরুল মুমিনিন ও সেনাপতি হিসেবে আলি (রা.)-কে অস্ত্র ধরতেই হলো এ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

এরই প্রতিশোধ হিসেবে ৪০ হিজরির ১৭ রমজান জুমার রাতে কুফায় ফজরের সময় আলি (রা.)-এর মাথায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। এর তিন দিন পর ৪০ হিজরির ২১ রমজান ৬৩ বা ৬৪ বছর বয়সে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

তখন একদল মুসলমান এত উচ্চমানের দৃশ্যমান তাকওয়া বা আল্লাহভীতি সত্ত্বেও তারা বর্বর হতে পেরেছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল, চিন্তার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয়হীনতা। অর্থাৎ তাদের ছিল প্রজ্ঞার অভাব।

এমন প্রজ্ঞাহীন মুসলমানদের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আলি (রা.)-এর কর্মনীতি ছিল প্রজ্ঞাময় ও বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে আলাদা সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেও আলি (রা.) তাদের মসজিদে আসতে বাধা দেননি। তিনি তাদের ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাপ্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করেননি এবং তারা আগে অস্ত্রধারণ না করা পর্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেননি।

একটি পরিচিতি; একটি পৃথক আইডেন্টিটি

---

[৯] সহিহ বুখারি : ৭৫৬২

[১০] সহিহ বুখারি : ৩৬১০; সহিহ মুসলিম : ২৪৫১

তাদের দর্শন ও কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় ও ব্যতিক্রমী পরিচিতি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এটি বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর জন্য দুঃখজনকও বটে।

মুসলিম সমাজে নানা যুগে নানা সময়ে মুসলিম আলিম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তাদের সুনির্দিষ্ট পরিচয়ে পরিচিত করেছেন বা করিয়েছেন। ইতিহাসে এরা খারেজি হিসেবেই পরিচিত।

'খারেজি' শব্দটি আরবি 'খুরুজ' (الخروج) শব্দ থেকে উদ্‌গত হয়েছে। এর সরল অর্থ—'বের হওয়া বা বেরিয়ে যাওয়া।' আর আরবি ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী বহুবচনে একে 'খাওয়ারিজ' বলা হয়ে থাকে। সংগত কারণেই ইসলামের ইতিহাসে তাদের নিয়ে চর্চা কম করা হয়নি। উম্মাহর ইতিহাসে তারা সূচনা করেছে অত্যন্ত কলঙ্কজনক, বেদনাদায়ক ও আত্মঘাতী এক অধ্যায়ের।

উম্মাহর প্রত্যেক যুগে প্রতিটি আলিম একমত, ইসলামি সমাজে এরাই হলো প্রথম বাতিল দল; ফিতনা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। তাদের হঠকারিতার কারণে উম্মাহকে চরম মাশুল গুনতে হয়েছে। আজও বিশ্বের নানা প্রান্তে মুসলিম সমাজে তাদের সরব উপস্থিতি বিরাজমান। কর্মক্ষেত্রেও এরা অত্যন্ত তৎপর।

আন্দালুসের প্রখ্যাত ইমাম ইবনে হাজম আন্দালুসি (রহ.) বলেছেন, খারেজি বলতে প্রত্যেক এমন সম্প্রদায়কে বোঝায়, যারা চতুর্থ খলিফা আলি (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মতামত কিংবা তাদের রায় অবলম্বনকারী—তা যেকোনো যুগেই হোক না কেন।

উক্ত মতানুসারে খারেজিরা কেবল সাহাবিদের যুগেই চিন্তার বৈকল্যে নিপতিত হয়ে উগ্র মতাদর্শ ধারণ করেছিল তা নয়। তাদের উপস্থিতি বরং পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজেও থাকবে বা থাকতে পারে।

এ কারণেই দেখতে পাই উম্মাহর উলামারা এই গোষ্ঠীর একটি বিশেষ সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন। এর মাধ্যমে যাতে অন্যান্য যুগেও তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়। তারা বলেছেন—খারেজি তারাই, যারা গুনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফির বলে। আর মুসলিম শাসক এবং সাধারণ লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

আলি (রা.)-এর শাসনামলের প্রায় ৫০০ বছর পরে প্রখ্যাত ইমাম শাহরাস্তানি[১১] তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন—খারেজি হলো প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যারা এমন হক ইমামের (শাসক) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যাকে লোকেরা ইমাম হিসেবে স্বীকার করেছে। আর সেটা চাই এই বিদ্রোহ সাহাবিগণের যুগে হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার বিরুদ্ধে হোক কিংবা তাঁদের পরবর্তী তাবেয়িদের যুগে অথবা তৎপরবর্তী যেকোনো শাসকের যুগেই হোক।

আলি (রা.)-এর শাসনামলের প্রায় ৫০০ বছর পরে এসে খারেজিদের তাত্ত্বিক সংজ্ঞা দাঁড় করানো হয়। সংজ্ঞা নির্ধারণে ইমাম ইবনে হাজম আন্দালুসি (রহ.)-এর মতামতও পাওয়া যায়। আর এরই মাধ্যমে খারেজি কারা—সে বিষয়ে যুগের ইমামদের একটি ঐকমত্য বা ইজমাও দাঁড়িয়ে যায়।

---

[১১] মৃত্যু : ৫৪৮ হি.

অবশ্য এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পেছনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের দলিলও রয়েছে। রাসূলুল্লাহর উক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে—যতবারই তাদের আবির্ভাব হবে, ততবারই তারা ধ্বংস হবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ ২০ বার বলেন।[১২]

আরও একটি হাদিসের বর্ণনায় দেখতে পাই, ভূপৃষ্ঠে সর্বদাই খারেজি আকিদার লোক থাকবে এবং সর্বশেষ তাদের মাঝেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।[১৩]

এভাবে চিন্তার জগতে নৈরাজ্যের সূত্রপাত হলো। সেই নৈরাজ্য ধারাবাহিকভাবে চলার কারণে তা আরও জটিল আকার ধারণ করল। চিন্তা ও দর্শনের নানা ব্যাখ্যা-বিকৃতির ওপর ভিত্তি করে মুসলিম মানসে খুলে গেল এক গভীর অস্থিরতার পথ।

এর ফলে প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করাল। নিজেদের মত ও পথকে উচ্চকিত করতে গিয়ে তারা প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি শুরু করল। তাদের বিশ্লেষণের সাথে ইসলামের কোনো সংশ্রবই থাকল না; যদিও সেসবের উপস্থাপনা ছিল কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার আদলেই।

আরও দুঃখের বিষয় হলো, চিন্তা আর মতপার্থক্যের বেলায় পরমতসহিষ্ণুতার একটা ধারা ছিল। এই ধারাটি বজায় ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে এবং তাঁর ওফাতের পরে প্রায় চার দশক পর্যন্ত। সেটিও ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে থাকল।

অপরের মত ও পথকে সহ্য করতে না পারার এই প্রবণতা বাড়তে থাকায় মুসলিম সমাজে গোষ্ঠী ও গোত্রসংখ্যাও বাড়তে থাকল হুহু করে। খোলাফায়ে রাশেদার শেষ দিকে এসে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হলো, তার মূলে ছিল চিন্তার নৈরাজ্য। একইভাবে আলি (রা.)-এর শাহাদাত এবং তারও পরে কারবালার দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই নৈরাজ্য গিয়ে ঠেকল এক নতুন মাত্রায়।

আলি (রা.) ও তাঁর পরিবার, প্রিয় নবিজি ও তাঁর রক্তধারার প্রতি আবেগ ও সম্মানকে উচ্চমাত্রায় বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হলো। তা কখনো কখনো ইসলামের মূল চেতনাকেও ছাড়িয়ে গেল। কোথাও কোথাও বরং ইসলামের একত্ববাদ, তাওহিদ ও রিসালাতের কেন্দ্রীয় শিক্ষার সাথেই সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ল।

শিয়ারা এমনই এক গোত্র। তারা সর্বক্ষেত্রে আলি (রা.)-কে অনুসরণ করে। শুরুর দিকে তারা নিজেদের শিয়ায়ি আলি বা 'আলির দল' হিসেবে পরিচয়ও দেয়।

আলি (রা.) খিলাফতের কতটা হকদার ছিলেন, তাঁর মর্যাদা অন্য সাহাবিদের তুলনায় কতটা উচ্চ ছিল, এ ধরনের অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় আলাপ ও বিতর্ক তোলা হলো সমাজে। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে আরেক ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হলো। ফলাফল? নড়বড়ে হতে থাকল চিন্তার জগতে ঐক্যের বুনিয়াদ।

এ সময় সমাজে এমন সব বুদ্ধিজীবী ও আলিমের আবির্ভাব হলো, যারা এইসব বিকৃতিকে আরও বেশি চটকদার রং লাগান শুরু করল। এরপর সেগুলো ইবাদতের নাম করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে লাগল; সফলও হলো।

---

[১২] ইবনে মাজাহ : ১৭৪; আলবানি হাসান বলেছেন; *সহিহুল জামে* : ৮১৭২

[১৩] ইবনে মাজাহ : ১৭৪; আলবানি একে হাসান বলেছেন।

এ রকম সময় এই খারেজিরা আবার দলে-উপদলে বিভক্ত হতে শুরু করল। একইভাবে দলে-উপদলে বিভক্ত থেকে থাকল শিয়ারাও।

তাদের মধ্যে বিভক্তির কথা শুনে অনেকে হয়তো আশ্চর্য হবে। কিন্তু কেন? তাদের মধ্যে এ রকম বিভক্তি কি অনিবার্য ছিল না? যারা খোদ সাহাবিদের ওপরেই আস্থা রাখতে পারেনি, সেখানে তারা নিজেরা কী করে নিজেদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপরে আস্থা রাখবে? অথচ সাহাবিরা ইসলাম শিখেছিলেন স্বয়ং নবিজির থেকেই!

তাদের বিভক্তি মধ্য দিয়ে জন্ম নিল আরও কিছু দল, আরও কিছু গোত্র। আজও তারা অনেক দলে-উপদলে বিভক্ত। যেমন : আলাভি, ইসমাইলি, জায়েদি, নুসাইরি। আমাদের উপমহাদেশেও রয়েছে বোহরা, আগাখানি, ইমামিয়াসহ বেশ কয়েকটি শিয়া ফেরকা।

খোলাফায়ে রাশেদার পর থেকেই ইসলামি সমাজে একদল বুদ্ধিজীবী ও গবেষকের আবির্ভাব ঘটল। তারা ইসলামের শিক্ষাকে কলুষিত করতে উঠেপড়ে লাগল মুসলিম ছদ্মবেশে। এটাও ছিল একটি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ। দীর্ঘদিন ধরে এ ধারা চলমান। আর এই শিক্ষার দ্বারা পরবর্তী যুগের মুসলমানদের চিন্তাচেতনাও প্রভাবিত হয়েছে মারাত্মকভাবে।

বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাস থেকে উদাহরণ তুলে ধরা এই ছোট্ট বইতে সম্ভব না। তবে চিন্তার ক্ষেত্রে কী ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, তার উদাহরণ দিতে শিয়া গোষ্ঠীর পরেও আরও একটি গোষ্ঠীর উদাহরণ টানা যায়। আর তা হলো জাহমিয়া গোষ্ঠী।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে খোরাসানের জনৈক জাহম ইবনে সাফওয়ান নামক একজন পথভ্রষ্ট লোক এই গোষ্ঠীর গোড়াপত্তন করেন। কুরআনের কিছু জ্ঞান ও কালামশাস্ত্রে পারদর্শিতা থাকলেও তিনি ছিলেন হাদিসশাস্ত্রে পুরোপুরি অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা নিয়েই তিনি ইসলামের নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও বাহাস শুরু করেন।

এই তর্কবিতর্কের ধারাবাহিকতায় দিনে দিনে সেটা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, ইসলামের তাওহিদের সাথেই সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। যেমন :

এক. তিনি ও তার অনুসারীরা আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলিকে অস্বীকার করে নামগুলোকে রূপক হিসেবে দাবি করেন।

দুই. আল্লাহই যে সর্বোচ্চ সত্তা, এটাও অস্বীকার করেন।

তিন. তিনি কুরআনকেও আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করতেন না। আল্লাহ কথা বলেন—এটাও স্বীকার করতেন না। কুরআনকে সৃষ্ট বলতেন। আব্বাসি খলিফা মামুন যে 'আল মেহনা' নামে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা-নির্ভর কার্যক্রম চালু করেন, তা এই মতবাদের কারণেই। আর সে সময় বাগদাদসহ আশেপাশের বিভিন্ন মুসলিম জনপদে কুরআন নিয়ে একধরনের বিভ্রান্তি আসন গেড়ে বসে।

চার. তিনি মনে করতেন, আল্লাহ সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির সাথে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে তার এ মতবাদটি সর্বেশ্বরবাদী ও হুলুলি লোকদের উপজীব্যে পরিণত হয়।

পাঁচ. তার কাছে ঈমান হচ্ছে শুধু আল্লাহকে চেনার নাম।

ছয়. তাকদিরের ওপর ঈমানের অধ্যায়ে তিনি মনে করতেন—মানুষ সব মাজবুর বা বাধ্য। অর্থাৎ মানুষ ভুলত্রুটি যা-ই করুক না কেন, এতে তার কোনো দোষ নেই। কারণ, মানুষ আল্লাহর ইচ্ছাতেই এগুলো করছে।

সাত. আখিরাতের ওপর ঈমান এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই যেমন : কবর আজাব, মিজান ইত্যাদি তিনি অস্বীকার করেন। জান্নাত ও জাহান্নাম যে পুণ্যবান ও পাপী লোকদের চিরস্থায়ী ঠিকানা, তিনি সেটাও অস্বীকার করতেন। তিনি মনে করতেন, এগুলোও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ হচ্ছে আসল জাহমিয়াদের আকিদা-বিশ্বাস। ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনের ওপর তাদের মতো এত বড়ো আঘাত আর কেউ করেনি। এজন্য ইমাম আবু সাইদ উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারেমি তাঁর *আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়া* গ্রন্থে তাদের কাফির বলেছেন। তাদের কাফির হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করেছেন।

পরবর্তী সময়ে তাদের এসব আকিদা বা বিশ্বাস বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে হুবহু অথবা কিছু পরিবর্তনসহ প্রবেশ করতে থাকে। জাহমিয়াদের এসব আকিদা বা বিশ্বাসের সারাংশ করলে বোঝা যায়, তাদের মূল সমস্যা ছিল আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ ও অধিকার নিয়ে।

পরবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করা মুতাজিলা সম্প্রদায়ও এমনই। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা থাকলেও তারাও এই জাহমিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কিংবা তাদের কাছাকাছি একটি গোত্র। অনুরূপভাবে শিয়াদের মধ্যে থেকে আশায়ারি ও মাতুরিদি গোষ্ঠীর লোকজনও এ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বজায় রাখতে তারা নিজেদের জাহমিয়া মুতাজিলা, জাহমিয়া আশায়ারি ও জাহমিয়া মাতুরিদি—এ রকম ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজেদের উপস্থাপন করে। তবে যে নামেই পরিচয় দিক না কেন, তাদের অধিকাংশই আহলুস সুন্নাতের আকিদাবিরোধী।

একটা সময় তাদের চিন্তাধারা চর্চা হতো অনেক বেশি। তাদের যুক্তি মুসলিম সমাজে এত বেশি আলোচনায় ছিল যে, সে যুগের অনেক ইমাম, ইসলামি পণ্ডিতও মাসয়ালা চয়নের ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীতও হয়েছেন।

অনেকে এই ইমামদের আশআরি বা মাতুরিদি মতবাদের লোক মনে করলেও সম্ভবত তারা এ গোষ্ঠীর লোক ছিলেন না। প্রকৃত সত্য একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

এত সব বাস্তবতা বিবেচনায় মূল বিষয়টি উঠে আসে। সেটা হলো, ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে আল্লাহ তায়ালা যে নির্দেশনাটি দিয়ে রেখেছেন, তা মানা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন—আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার

পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তিসম্পন্নরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।'[১৪]

এই মৌলিক নির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ পরবর্তী সময়ে আর করা হয়নি। ফলে মুসলিম মানসে চিন্তার নৈরাজ্য অনেকটাই স্থায়ী ক্ষত হিসেবে থেকে যায়। দল-উপদল, গোত্র আর গোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তা ও আদর্শ নিয়ে যেমন লড়াই-দ্বন্দ্ব চলেছে, ঠিক তেমনই লড়াই চলেছে বংশীয় প্রভাব বিস্তার বা প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিয়েও।

আব্বাসীয় কিংবা উমাইয়া, ফাতেমি কিংবা মামলুক; সবার ক্ষেত্রেই এই একই কথা খাটে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থেকেছে, তেমনই লিপ্ত থেকেছে নিজেদের মধ্যে আন্তঃগোষ্ঠী দ্বন্দ্বেও।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা এই দ্বন্দ্ব মুসলিম সমাজের কেন্দ্রীয় ঐক্যকে নস্যাৎ করেছে। একইভাবে তিরোহিত করেছে একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকেও। বস্তুত এসবের পর মুসলিমদের মধ্যে আর কোনো কার্যকর ঐক্যই গড়ে উঠতে পারেনি। অথবা বলা চলে, গড়ে ওঠার কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি।

প্রথম হোঁচট

এ রকম পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলিম সমাজ ইউরোপের মাটিতে সর্বপ্রথম ধাক্কা খায়।

৭১৯ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি মুসলিমরা নিজেদের স্পেনের মাটি থেকে উত্তর দিকে পাইরেনিজ পর্বতমালা পেরিয়ে আধুনিক ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে টেনে নেয়। এর মাত্র ছয় বা সাত বছরের মধ্যে ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মধ্য ফ্রান্সের বুরগুন্ডি (Burgundy) শহরে পৌঁছে যায়। ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক ফ্রান্সের আর্লস (Arles) শহরে গিয়ে হাজির হয় মুসলিমরা!

তখন 'ফ্রান্স' নামে কোনো দেশই ছিল না, ছিল গল বা গউল (Gaul)। আধুনিক ইতালি ও জার্মানির বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত এ ভূখণ্ডটি হলি রোমান অ্যাম্পায়ারের অন্তর্ভুক্ত। একে খ্রিষ্টবাদের প্রাণকেন্দ্রই বলা চলে। পোপের সকল ক্ষমতা, প্রভাব ও আয়ের উৎস ছিল বিস্তৃত ও বিশাল এই ভূখণ্ড।

সংগত কারণেই মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রা এবং নিজের বুকের ওপরে আসন গাড়তে দেখে ঘুম হারাম হয়ে গেল পোপের। তবে তার কপাল ভালো, পোপের কান্নাকাটি আর দেনদরবারে সেকালের ফরাসি রাজা চার্লস মার্টেল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'ব্যাটল অব ট্যুর' বা 'ব্যাটল অব পয়টার' হিসেবে পরিচিত।

এরপর থেকে পুরো ইউরোপীয় সমাজ; বিশেষ করে পোপ ও পাদরিরা ছক কষতে শুরু করেন। এ লক্ষ্যে পোপের নেতৃত্বে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা এক ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেন। তারা তাদের শত শত চরকে অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা দিয়ে আন্দালুস, গ্রানাডা, সেভিল, কর্ডোভার গ্রামে-গঞ্জে, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

---

[১৪] সূরা আলে ইমরান : ৭

জনৈক ফরাসি পাদরি 'Perfectus'-এ ধারার সূচনা করেন। শত শত প্রশিক্ষিত পাদরিকে ছদ্মবেশী আলিম হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের দিয়ে মাজহাবি বিতর্ক উসকে দেওয়া এবং তা বছরের পর জিইয়ে রাখাই ছিল সেই কর্মসূচির অংশ। ফলে মুসলমানরা, বিশেষ করে আলিমদের একটা বিরাট অংশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কার আকিদা সঠিক, কার আকিদা ভুল, কে কাফির, কে মুনাফিক—তারা এসব জটিল(!) গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন!

তারা মুসলিম সমাজে বেতনভুক্ত লেখক, বক্তা ও বুদ্ধিজীবীও নিয়োগ দেয়। বহু খ্রিষ্টান পাদরিকে মুসলিম সমাজে খ্রিষ্টান পরিচয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রকাশ্যে রাসূলের জীবন ও কর্মকাণ্ড বিষয়ে কটূক্তি করানো হয়। উসকে দেওয়া হয় মুসলিম ও খ্রিষ্টান দ্বন্দ্ব। সৃষ্টি করা হয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্যের।

আন্দালুসের মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেননি। কারণ, তখন তারা ছিলেন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিভোর। ফলে মুসলিম আন্দালুস মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যেই খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়। এই বিভক্ত একপর্যায়ে এক এক করে ২৩টি ছোটো ছোটো রাজ্যে ভাগ হয়ে পড়ে।

এসব রাজ্যের কোনোটাই নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপরে ভিত্তি করে টিকে থাকার মতো সক্ষমতা ছিল না। তাদের না ছিল পর্যাপ্ত ভূসম্পদ, আর না ছিল শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি; গণভিত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না।

আর রাজ্যের মহামান্য(!) সুলতান আর আমিররা নিজেদের বাবা বা ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে। কাজেই তারা নিজেরাও নিজেদের ভাই, সন্তান, আত্মীয়স্বজনকে বিশ্বাস করতে পারত না; এমনকি রাতের আঁধারে নিজেদের ছায়াকেও শত্রু হিসেবে দেখত।

তারা একটা মুহূর্তও কেউ কাউকে বিশ্বাস করেনি। নিজেদের জানমাল ও ক্ষমতার নিরাপত্তার জন্য তারা বরং জনগণের ট্যাক্সের টাকায় ভাড়াটে খ্রিষ্টান মার্সিনারি সৈন্য পুষেছে।

পার্শ্ববর্তী ছোটো ছোটো খ্রিষ্টান রাজাদের অবস্থা ছিল, তারা তারিক বা আবদুর রহমান কিংবা ইউসুফ বিন তাশফিনের নাম শোনামাত্রই ভয়ে-আতঙ্কে কাপড় ভিজিয়ে ফেলত। সেই রাজাদেরই নিজেদের রক্ষক ও বন্ধু হিসেবে মেনে নেয়; এমনকি তাদের সাথে পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি কিংবা সহযোগিতা চুক্তিও করে!

এসব চুক্তির বলে মুসলমানদের ঐক্য ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে। এক গোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বী অপর কোনো মুসলিম গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ কিংবা যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রতিবেশী খ্রিষ্টান রাজাদের সামরিক সাহায্যও নিতে শুরু করে।

কাজেই নিজ দেশে খ্রিষ্টান পাদরিদের পরিচালিত অন্তর্ঘাতমূলক এইসব কর্মকাণ্ড দমনে সুলতান ও আমিররা কার্যকর ও কঠোর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। বরং তারা ছিল চুক্তিতে আবদ্ধ প্রতিবেশী খ্রিষ্টান রাজ্য এবং তার জনগণের অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত। এই ভয়ে মুসলমান শাসকরা রাসূলকে বিদ্রুপ ও অপমানকারী এইসব খ্রিষ্টান পাদরির মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে সমুদ্রের ওপারে অর্থাৎ আধুনিক মরক্কোর সোয়েটা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়েই দায় সারে! সেভিলের সুলতান এ কাজটা করেছিলেন বলে ইতিহাসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

সেকালের বিশ্বে সবচেয়ে ধনাঢ্য সমাজ; বাংলা, ভারত ও বাগদাদের পরে মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে এই আন্দালুসও বিশ্বের সবচেয়ে ধনাঢ্য এলাকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একই সাথে প্রাচীন হেলেনো-ল্যাটিন-টলেমি এবং ইন্দো-ব্যাবিলনীয়-আরব জ্ঞানবিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটে এ জনপদে।

ফলে মাত্র কয়েকটি দশকের মধ্যেই এ ভূখণ্ড বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্বে বাগদাদ ও দামেশকের সমকক্ষ হয়ে পড়ে। কোনো কোনো বিচারে তো তাদের চেয়েও উঁচু স্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে পরিণত হয়! পরিণত হয় কুরআন, হাদিস, দর্শন আর ফিকহচর্চার এক অনন্য তীর্থস্থান হিসেবে!

আন্দালুসের ইতিহাসে উমাইয়া খলিফা হিশামের পক্ষে মুহাম্মাদ ইবনে আবু আমেরের দীর্ঘ ২৭ বছরের শাসনকাল ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। উত্তর দিকে ফ্রান্সের সীমান্ত এবং পশ্চিম দিকে আটলান্টিকের তীরঘেঁষে ছোটোখাটো দু-একটা খ্রিষ্টান রাজ্য তখনও কোনোমতে টিকে ছিল। তাদের হৃদয়েও এই মহান ব্যক্তি কাঁপন তুলে দিয়েছিলেন।

কিন্তু একাদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে[১৫] খলিফা হিশামের মৃত্যুর পরপরই বদলে যায় পুরো চিত্রপট। গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। একই সাথে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রও। এই ষড়যন্ত্রের হাত ধরে ক্ষমতার জন্য পিতা-পুত্র, ভাই ভাই, পরিবারের এক সদস্যের সাথে অপর সদস্যের দ্বন্দ্বও চলতে থাকে। দেখতে দেখতে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

ব্যাপারটা এমন, তখন এক ভাই আরেক ভাইকে ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিতে পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান শাসক ও ভূস্বামীদের দারস্থ হয়। আর চাতক পাখির মতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকা খ্রিষ্টান শাসকরা এই সুযোগকে লুফে নেয়। তারা মুসলমান শাসকদের সাহায্য করতে দু-বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসে।

ক্ষমতার স্বাদ না পাওয়া কিংবা যথাযথভাবে ভোগ করতে না পারার আক্ষেপে ফুঁসছিল এই যুবরাজরা। ফলে তারা বন্ধু খ্রিষ্টানদের সাহায্য-সহযোগিতা, পরামর্শ, উৎসাহ ও রসদ নিয়ে নিজ পিতা বা চাচা বা ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে! খিলাফতের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসে। ছোটো ছোটো অঞ্চল দখলে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে থাকে একের পর এক সালতানাত।

এই মহামান্য সুলতান আর আমিরগণ(!) বছরের পর বছর ধরে পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান রাজাকে বাৎসরিক করও দিয়ে এসেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল, আক্রান্ত হলে এই সমস্ত খ্রিষ্টান রাজা যেন তাদের নিরাপত্তা দেন।

মজার বিষয় হলো, এইসব রাজ্যের খলিফা বা আমিরগণ সকলেই ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন মুসলমান। তারপরও তারা শুধু ক্ষমতার লোভে একে অপরের গলা কাটতে ব্যস্ত থেকেছে। তাদের বেশির ভাগ নেতার কাছেই বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থের চেয়ে নিজেদের পরিবার বা বংশ বা গোত্রের স্বার্থই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রমাণ দেখতে পাই খলিফা মুসতাইনের কর্ডোভা আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়। এ সময় তিনি খ্রিষ্টান রাজা ইবনে আলফানসোর কাছে গোপনে সাহায্যের আবেদন নিয়ে দূত পাঠান।

---

[১৫] ১০০২ খ্রি.

অপরদিকে ওই একই সময়ে তার প্রতিপক্ষ আরেক মুসলিম সুলতান মাহদিও গোপনে সাহায্যের আবেদন করেন। এমনকি তিনি খ্রিষ্টান রাজাকে আশ্বাসও দেন–খলিফা মুসতাইনের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করলে যুদ্ধ জয়ের পরে কৃতজ্ঞতাস্বরূ তার রাজ্যের সীমান্তসংলগ্ন মুসলিম দুর্গগুলো খ্রিষ্টান রাজাকে হস্তান্তর করবেন!

তবে খ্রিষ্টান রাজা ইবনে আলফানসো এতটা বোকা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান। ফলে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের বিপরীতে খ্রিষ্টবাদের লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ করেই তিনি দুর্বল মাহদির বদলে শক্তিশালী মুসতাইনকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন।

কারণ তিনি জানতেন, সুলতান মাহদির যে অবস্থা, তাতে শক্তিশালী ও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা খলিফা মুসতাইনই জিতবেন। ইবনে আলফানসো কালক্ষেপণ না করে এক হাজার ষাঁড়, পনেরো হাজার ছাগল এবং অস্ত্রসহ কয়েক হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য পাঠালেন বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে।

এ ভূখণ্ডে ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও ক্ষমতার পালাবদলে নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠতে খ্রিষ্টান রাজাদের জন্য এটা ছিল এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

নিজেদের মধ্যে আন্তঃকোন্দলের মতো এ হঠকারিতার মূল্য কেবল একা মাহদিই দেননি। এর মূল্য দিতে হয়েছে খোদ খলিফা মুসতাইনকেও। এমনকি সুলতান মাহদির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পরেও খলিফা মুসতাইনকে প্রচুর মাশুল গুনতে হয়েছে। আর এই মাশুল ছিল যুদ্ধে পরাজয়ের থেকেও বেশি। এর চাইতে পরাজিত হওয়াটা আরও বেশি সম্মানের হতো। সম্ভবত তা ওই ভূখণ্ডে মুসলিম জনগণের জন্যও কল্যাণকর হতে পারত!

ক্ষমতা পেতে আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত মাহদি ও খলিফা মুসতাইন; তাদের কেউই এ যুদ্ধে জিততে পারেননি। উভয়কেই তাদের হঠকারিতা আর নির্বুদ্ধিতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ইবনে আলফানসোর সাহায্যে মুসতাইন কর্ডোভার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত খলিফা মাহদিকে ক্ষমতাচ্যুত ও দেশছাড়া করেন। অধিষ্ঠিত হন ক্ষমতায়।

এই উভয় মুসলিম সেনাপতির অনুসারী সৈন্যরা সকলেই ছিলেন মুসলমান। পরাজিত খলিফা মাহদির পক্ষে যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে, তারা মুসলমান ছিলেন। একইভাবে যুদ্ধে বিজয়ী মুসতাইনের দলের যারা নিহত হয়েছেন, তারাও ছিলেন কর্ডোভারই মুসলমান। অর্থাৎ উভয় পক্ষে মুসলমানরাই মারা গেছে।

বিজয়ের পরে কর্ডোভার ক্ষমতায় বসলেও খলিফা মুসতাইনও এই যুদ্ধে জয়ী হননি। কিছুদিনের মধ্যেই তিন রাজ্য হারিয়ে বসেন; তাও আবার সেই বন্ধু খ্রিষ্টানদের হাতেই!

কর্ডোভার মুসলিম খলিফা; বন্ধু(!) মুসতাইনের সাহায্যে এগিয়ে আসা খ্রিষ্টান রাজা ইবনে আলফানসোর পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত কুটিল। যুদ্ধের পরে বিজয়ী খলিফা মুসতাইনের সহযোগী হিসেবে প্রবেশ করে তথাকথিত বন্ধুরাষ্ট্রের(!) খ্রিষ্টান সৈন্যরা। তাদের লক্ষ্য ছিল অন্য কিছু। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই তারা মুসতাইনকে সহযোগিতা করতে এসেছিল; তাকে ভালোবেসে নয়।

সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তারা কোনো রাখঢাকও রাখেনি। তারা বরং মুসতাইনের চোখের সামনেই তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে। পরিকল্পনার প্রথম পর্বে তারা কর্ডোভার শত শত আলিম ও

পণ্ডিত ব্যক্তিকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করে! কর্ডোভায় বুদ্ধিজীবী হত্যা ঘটিয়ে দেশটির বুদ্ধিবৃত্তিক রক্ষাকবচ ভেঙে দেওয়া হয়!

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! খলিফা মুসতাইনকে তার দেশের বাঘা বাঘা পণ্ডিত আলিমদের খ্রিষ্টান সৈন্যদের হাতে কচুকাটা হতে দেখতে হলো নিজ চোখে! নিজের চোখে, নিজের দেশে, তার নিজেরই প্রজাসাধারণ, সাধারণ মুসলমানদের নির্মম হত্যাকাণ্ড, পৈশাচিক বর্বরতা দেখেও সে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারল না!

কারণ, যারা এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটাচ্ছে, তারা প্রতিবেশী খ্রিষ্টান রাজ্যের খ্রিষ্টান সৈন্য হলেও এই বন্ধুরাই তাকে কর্ডোভা জয় করতে সাহায্য করেছে; পাছে সেই বন্ধুরা না আবার অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে!

এভাবেই জ্ঞানবিজ্ঞানের লীলাভূমি কর্ডোভার উন্নতি আর প্রগতির চাকা থামিয়ে দেওয়া হয়। পেছনে মূল চালিকাশক্তি মুসলিম স্কলারদের হত্যার মাধ্যমে খ্রিষ্টান রাজা দেশটির বুদ্ধিবৃত্তিক রক্ষাকবচটা ভেঙে দেন। তারপর সেই ভাঙা কর্ডোভার শাসনভার তুলে দিলেন খলিফা মুসতাইনের হাতে।

তবে এ কর্ডোভা আর আগের কর্ডোভা ছিল না; বরং এটি ছিল চরম নৈরাজ্যে ভরপুর একটি সমাজ। অনাস্থা আর অবিশ্বাসে ভরপুর। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই দেশটি চরম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিপতিত হয়। এর পরে এই ধারাতেই মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই দেশটি চূড়ান্তভাবে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে।

এ ঘটনার মাধ্যমে খ্রিষ্টান পোপ ও পাদরিরা আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। শুধু পোপ ও গির্জার পাদরিরাই নয়; বরং আন্দালুসের এই ঘটনা বিশ্বের সমগ্র খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীকেই আবার নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

এভাবে প্রতিষ্ঠার মাত্র অর্ধ শতাব্দী যেতে না যেতেই ইসলামি খিলাফতের পতনের ধারাও শুরু হয়ে যায়। ৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সারাগোসা (Zaragoza) অঞ্চলে মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে ইবনে ইয়াকদান আল আরাবি আল কালবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহ সফল করতে তিনি ফ্রান্সের রাজা শার্লম্যানের কাছে সাহায্যের আহ্বান জানান।

আর রাজা শার্লম্যানও অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে সুলাইমানের সেই আহ্বানে সাড়া দেন। একসময় খ্রিষ্টানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ভূমিতে মুসলিমরাই আবার এভাবে খ্রিষ্টানদের ডেকে আনে। তাও আবার মুসলিমদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরতেই!

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস!

আর এভাবেই মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দুর্বলতা পোপ ও পাদরিদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তারাও আর দেরি না করে উত্তরাঞ্চলীয় সাগর পারের শহর 'সান্তান্দার' ও 'ওবেদো' থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু করে।

এরপর তারা আর থামেনি। দীর্ঘ সময় ধৈর্য আর ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নিষ্ঠার সাথে লেগে থেকেছে। ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে খ্রিষ্টানরা উত্তর-পূর্বের 'বার্সেলোনা' শহর থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিমের 'পোর্টো' পর্যন্ত দখল করে নেয়। ১০৮০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তারা স্পেনের মধ্যভাগ পর্যন্ত দখল করে ফেলে।

তখনও মুসলমানরা সেই একইভাবে একে অপরের আকিদা মাপা এবং তার বিচারে মগ্ন ছিল। তাদের চিন্তার জগতে নৈরাজ্যও ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছিল।

পোপের কুটিল কৌশল : সুইসাইড মিশন

মুসলমানরা পরস্পর পরস্পরের গলা কাটতে ব্যস্ত থাকলেও খ্রিষ্টানরা ছিল নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত আপামর খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ নিত্যনতুন ফন্দি আঁটতে থাকে—কীভাবে মুসলমানদের উসকে দিয়ে মাঠে নামানো যায়।

এ রকম একটি ঘটনা ঘটে কর্ডোভায়; নবম শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে। ঘটনাটি ছিল এ রকম—একজন খ্রিষ্টান পাদরি কর্ডোভার বাজারে মুসলিম জনসমাগমপূর্ণ স্থানে মুসলমানদের সামনেই প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করতে থাকে।

সময়টা ছিল জুমার দিন দুপুরবেলা। একপর্যায়ে সে বাজারের এক প্রান্তে অবস্থিত প্রধান মসজিদের চত্বরে দাঁড়িয়ে বা তারই আশেপাশে প্রিয় রাসূলকে গালাগাল করতে থাকে। ফলে মুসল্লিদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কটূক্তিকারী পাদরিকে ধরে তারা উত্তমমধ্যম দেয়। তারপরও সে নিবৃত হয়নি।

কাজেই, লোকজন তাকে টেনেহিঁচড়ে কাজির সামনে হাজির করে। পাদরি নিজের অপরাধের কথা অবলীলায় স্বীকার এবং আদালত চত্বরেই আবারও সে রাসূলকে অবমাননা করে বসে। উপায়ান্তর না দেখে কাজি তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ফলে সে খ্রিষ্টবাদের উদ্দেশ্যে প্রাণোৎসর্গকারী একজন বীর হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। পোপ ও পাদরিসমাজ এ ধরনের আত্মোৎসর্গকে মহিমান্বিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে থাকে। নানা ধর্মসংগীত রচিত হতে থাকে খ্রিষ্টবাদের এই বীরদের উদ্দেশ্যে! পুরো খ্রিষ্টবিশ্বজুড়েই একধরনের উত্তেজনা ও ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়।

একই রকম ঘটনা পরপর আরও ঘটতে থাকে। বেশ কয়েকজন পাদরিকে এভাবে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়। কিন্তু ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাতে থামল না; বরং আরও বেড়ে যেতে থাকল। কর্ডোভার জনসমাজে বিষয়টি দারুণ বিতর্ক ও অস্থিরতার জন্ম দেয়।

খুব সহসায় এ রকম আরও একটি ঘটনার সূত্রপাত হয়।

একদিন স্থানীয় এক খ্রিষ্টান পাদরি কর্ডোভার বাজারে বাজার করতে যায়। এক দোকানে সে জিনিসপত্র কেনার জন্য ঢোকে। কিন্তু সেখানে আগে থেকেই কিছু মুসলিম বসে গল্প করছিল।

একজন খ্রিষ্টান পাদরিকে ঢুকতে দেখে তার সাথে তারা অপ্রয়োজনীয় আলাপ জুড়ে দেয়। ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মসংক্রান্ত নানা ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। এ দুটি ধর্মের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ এবং কেন শ্রেষ্ঠ? এমন প্রশ্নও তারা করে বসে উক্ত পাদরির কাছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন যেমন বাড়তে থাকে, তেমনই বাড়তে থাকে উত্তেজনাও।

খুব শীঘ্রই পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্য সেভিলেও এ রকম ঘটনার সূত্রপাত হতে থাকল। সেভিলের মুসলমান শাসকরা বুঝতে পারেন—খ্রিষ্টান পাদরিদের উদ্দেশ্যই হলো, কিছু অতি আবেগী খ্রিষ্টানকে দিয়ে এ রকম ঘটনা ঘটিয়ে শহিদি মর্যাদা পেয়ে তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুরো ইউরোপব্যাপী খ্রিষ্টান জনমানসকে খ্যাপিয়ে তোলা।

মূলত এটা ছিল পোপেরই পরিকল্পিত একটি সুইসাইড মিশন! রাজ্যের খ্রিষ্টান ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের চিড় ধরানোই ছিল এই মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিষয়টি বুঝতে পারেন সেভিলের সুলতান। তিনি এ রকম অপরাধে অভিযুক্ত কিছু পাদরিকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে মরক্কোর সিয়োটা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। এতেও সমস্যার সমাধান হলো না। এইসব পাদরি সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে এবং জেনে-বুঝে নিজেদের ওপর মৃত্যুদণ্ডের বিধান টেনে আনে।

মুসলমানরাও পাদরিকে প্রশ্ন করতে থাকে ঈসা (আ.) ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এ দুয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? অতি উৎসাহী মুসলমানদের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন করাটাই সমীচীন ছিল না। কারণ, সূরা বাকারার শেষে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন—'আমরা এমন মুসলমান, যারা আল্লাহ রব্বুল আলামিন কর্তৃক প্রেরিত সকল নবি-রাসূলকে বিশ্বাস করি এবং তাঁদের ওপরে ঈমান পোষণ করি। তাঁদের কারও মধ্যেই কোনো রকম পার্থক্য করি না।'

কাজেই এ অবান্তর প্রশ্ন ওই পাদরিকে ফাঁদে ফেলার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। খ্রিষ্টান পাদরি স্বাভাবিকভাবেই ঈসা (আ.)-কে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে। আর শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নবিজিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য ও ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে বসে।

পাদরির মুখে প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপার আপত্তিকর মন্তব্য শুনে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে অনেকেই ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে পাদরির ওপর হামলে পড়ে।

কিছু ব্যক্তি ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই উক্ত পাদরিকে ধরে স্থানীয় কাজির দরবারে নিয়ে হাজির করে। কাজির কাছে তার বিচার চায়। তাদের দাবি একটাই, পাদরিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এমনকি আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেকেই পাদরির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেও চলে আসে। এই সাক্ষীদের মধ্যে অনেকেই ঘটনার সময় ওখানে ছিল না। তবে বাজারে ঘটনা ঘটার দরুন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর তেমন অভাবও ছিল না।

পুরো ঘটনা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনার পরে কাজি পাদরিকে প্রশ্ন করলে সে সব অভিযোগ স্বীকার করে নেয়।

অথচ একজন খ্রিষ্টান ধর্মীয়ভাবেই নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবি হিসেবে স্বীকার করে না। এটা জানা সত্ত্বেও তাদের এ ধরনের বিতর্কে টেনে নামানো এমন প্রশ্ন করাটাই তো অন্যায়ের মধ্যে পড়ে।

কারণ, এ ধরনের প্রশ্ন করার পেছনে মূল উদ্দেশ্যই থাকে প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করা। উসকে দিতে পারলে সে নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারাবে। তখন তাকে দিয়ে এমন কিছু করানো বা বলানো যাবে, ফলে তাকে সমাজ কিংবা আইনের সামনে অপরাধী সাব্যস্ত করা সহজ হবে। কিন্তু বিজ্ঞ কাজি উক্ত পাদরিকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে কেবল ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে ছেড়ে দেন। মুসলমানদের দাবি তিনি অগ্রাহ্য করেন।

কাজি ঠিকই বুঝেছিলেন, সমাজে ধর্মীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি করে খ্রিষ্টানদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীকে খ্যাপিয়ে তোলা ছাড়া এই বিচারের আর কোনো

উদ্দেশ্য নেই। সমস্যা হলো, কাজি বিষয়টি বুঝতে পারলেও সমাজের অধিকাংশ জনগণ; এমনকি নেতারাও এটা বুঝতে পারেননি। ফলে খ্রিষ্টান পাদরি, পোপ ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় সফলই হয়েছিল বলা যায়।

ক্রমাগত ২৪৮ বছর খ্রিষ্টানদের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্যাপিয়ে তুলে ১০৯৬ বা ১০৯৯ সালে পোপ আরবান চূড়ান্তভাবে ক্রুসেডের ডাক দেন। শুরু হয়ে যায় ক্রুসেড।

এ রকম পরিস্থিতি থেকে মুসলিম বিশ্ব উঠে আসবে, তেমন সুযোগ তাদের হাতে ছিল না। কারণ, তখন তারা ছিল শতধা বিভক্ত ও অন্তঃকলহে মগ্ন। এ সুযোগে ১১৬০ সালের মধ্যেই পর্তুগালের রাজধানী লিসবন, স্পেনের টলেডো, সারাগোসা রাজ্যগুলো মুসলমানদের হাতছাড়া হয়।

আর ১২১২ সালে তিন-চতুর্থাংশ এলাকা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়। ১২৫০ সাল নাগাদ এ ভূখণ্ডের ২৩টি মুসলিম রাজ্যের মধ্যে এক এক করে ১৯টি রাজ্যই খ্রিষ্টানরা গিলে ফেলে। অথচ টিকে থাকা বাকি চারটি মুসলিম রাজ্য নিজেদের মধ্যে তখনও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি!

বিজয় ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সীমাহীন গৌরবের। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ আর চিন্তার জগতে নৈরাজ্যের কারণে সহসায় তা লজ্জা, অনুশোচনা ও কলঙ্কে পরিণত হয়!

দৃশ্যপটের পরিবর্তন

এরই মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই (১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) দৃশ্যপটে তাতারদের আবির্ভাব ঘটে। উত্তর চীন এলাকা থেকে উঠে এসে ঝড়ের গতিতে তারা এসে পড়ে মুসলিম বিশ্বের ওপরে। খাওয়ারিজম রাজ্যর ওপর ভয়ংকর মোঙ্গল সৈন্যদের হামলার মাধ্যমে এ ফিতনার শুরু। পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে তাদের ধ্বংসলীলা আর থামেনি।

ততদিনে অবশ্য আব্বাসীয় শাসনে রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। আন্দালুসের মতো এখানেও ক্ষমতালোভী নেতারা নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। আর সেই সাথে শতাব্দী পুরোনো শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব তো আছেই। অর্থাৎ এখানেও সেই একে অপরের ঈমান, আকিদা আর মানহাজ পরিমাপের কালচার চালু ছিল। পারস্যের কেন্দ্রভূমি হওয়ার কারণে তা বরং আরও বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছিল।

বীর গাজি সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের কাছে এক আতঙ্কের নাম। কিন্তু আরব উপদ্বীপ, মিশর ও সিরিয়ার একটি বড়ো অংশেও তার মৃত্যুর পরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও নৈরাজ্য শুরু হয়ে যায়।

সালাহুদ্দিনের সন্তানরাও রাজ্য ভাগ নিয়ে পরস্পরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত; এমনকি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়ে। ফলে বাগদাদ থেকে শুরু করে মসুল, দামেশক, আলেপ্পো, কায়রো, কর্ডোভাসহ বলা চলে পুরো মুসলিম বিশ্বই এক তথৈবচ অবস্থার মুখে পড়ে যায়।

সমাজে বাড়তে থাকে নৈরাজ্য ও বিভক্তি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভেঙে পড়ে। বিশ্বের বুকে ঐতিহ্যধারী মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার অন্য দিকে ইউরোপ থেকে ক্রুসেডার খ্রিষ্টানরাও একের পর এক সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিশরে অভিযান চালাতে থাকে।

আর ঠিক এ সুযোগেই মোঙ্গলরা বাগদাদে হামলা করে বসে। তারা সেখানে পৈশাচিক ধ্বংসলীলা চালায়। শেষমেশ তাদের হাতে বাগদাদের পতন হয় এবং ৬৫৬ হিজরিতে খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ নিহত হন। এরপর চেঙ্গিস খানের বাকি অনুসারীরা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। আইনে জালুতের যুদ্ধ পর্যন্ত তা চলমান থাকে।

শেষ পর্যন্ত মোঙ্গলরা সুলতান কুতুজ ও তার সেনাপতি বাইবার্সের নেতৃত্বে মামলুকদের হাতে পরাজিত হয়। ১২৬০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিনের গাজার কাছে আইন জালুত নামক স্থানে উভয় বাহিনীই পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। ইতিহাসে এটি আইনে জালুতের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এই যুদ্ধ ছিল মোঙ্গলদের ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা। এ পরাজয় তাদের দম্ভ, অহংকার আর গৌরবগাথাকে ম্লান করে দেয় অনেকখানি।

একটা ধারণা সবার ভেতরে ছিল—মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল মনুষ্যশক্তি-বহির্ভূত একটা কাজ। কেনানা, মরু প্রান্তরের সকল বাধাবিপত্তি তাদের কাছে হার মেনে গিয়েছিল। পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, সমুদ্র ও আবহাওয়ার গতি, দুর্ভিক্ষ, মহামারি কোনো কিছুই তাদের রুখতে পারে না। কিন্তু এই যুদ্ধ সেই ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়।

মোঙ্গলদের কাছে আইন জালুতের এই পরাজয়ের স্বাদ ছিল অত্যন্ত তিক্ত। এই পরাজয় তাদের গোত্রীয় গর্ব ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়। ভেঙে পড়ে তাদের নৈতিক মনোবলও।

পরবর্তীকালে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই মোঙ্গল তাতাররা ইসলামের কাছে আশ্রয় নিয়ে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের হাতে পরবর্তী সময়ে রচিত হয় পুরো পৃথিবীর ইতিহাসেরই নতুন এক অধ্যায়।